Vol. 53 | No. 3 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুলের শিশু-নাটক : নজরুল-প্রতিভার এক অনন্য উদ্ভাস

Volume	53
Issue	3
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোনালিসা দাস
Published online	June 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i3.5
Pages	৮৭-১০২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Check for updates

নজরুলের শিশু-নাটক : নজরুল-প্রতিভার এক অনন্য উদ্ভাস

মোনালিসা দাস*

সারসংক্ষেপ : বক্ষ্যমান প্রবন্ধে শিশু-নাটক রচনায় নজরুলের সার্থকতা বিচারের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে। নজরুল অনেক শিশু-নাটক লিখেছেন। তবে বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর *পুতুলের বিয়ে*, *জাগো সুন্দর চির কিশোর* এবং *পণ্ডিতমশায়ের ব্যাঘ্র শিকার* – এই তিনটি নাটক আলোচিত হয়েছে। নজরুল-প্রতিভার একটি স্বতন্ত্র প্রান্ত এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯ - ১৯৭৬) বাংলা সাহিত্যে, বাংলার সমাজে এবং বাঙালির চিন্তনের জগতে কতখানি স্থান অধিকার করে আছেন তা আজ আর নতুন করে বলবার অপেক্ষা রাখে না। তা সত্ত্বেও সম্ভবত অসত্য ভাষণ হবে না, যদি বলা যায় যে, শিশু-কিশোরদের জন্যে যে সৃষ্টিসম্ভার তিনি রেখে গেছেন, কয়েকটি কবিতা ছাড়া তার সম্যক সংবাদ সম্ভবত আমরা রাখিনি।

বর্তমান নিবন্ধের বিষয় 'নজরুলের শিশু-নাটক : নজরুল-প্রতিভার এক অনন্য উদ্ভাস'। এই বিষয় নিয়ে কিছু বলতে গেলে একদিকে জানতে হবে নজরুল কি কি শিশু-নাটক লিখেছেন এবং তার প্রকৃতি; অন্যদিকে জানতে হবে 'শিশু-নাটক' এই রূপকল্পের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য।

প্রথমে নজরুলের কথাই অল্প একটু বলা যাক। অল্প কারণ, তাঁর জীবনীও এখন আমাদের কাছে বিভিন্নভাবে উপস্থিত করেছেন বহু তন্নিষ্ঠ গবেষক। সেখান থেকেই উপাদান চয়ন করে আমরা কেবল নজরুলের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর জীবন নিয়ে কয়েকটি প্রসঙ্গের অবতারণা করব, সেখান থেকে বোঝা যাবে শিশু-কিশোরদের মনকে তিনি কীভাবে অনুভব করেছেন।

দরিদ্র পরিবারের সন্তান নজরুল নিতান্ত বালক বয়সেই মক্তবের শিশু-ছাত্রদের পাঠ দিয়েছেন। শিশুদের মনকে সম্ভবত তিনি এভাবেই বুঝিয়েছিলেন যে, যতই থাকুক

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

দারিদ্র্য আর অভাব, শিশু-মনের কল্পনার জগতের আনন্দের প্রবেশের পথ কখনওই রুদ্ধ হয় না। তাই তাঁর শিশু-নাটকের শিশুরা কল্পনালোকে ভেসে যেতে পারে সহজেই। আমরা জানি বালক নজরুল কখনও গৃহভৃত্যের কাজ করেন; কখনও রুটির দোকানের কর্মীরূপে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করেছিলেন; তা তাঁর নাটকেই বালক ও কিশোরেরা কল্পনালোকের পাশাপাশি কাজের জগতকেও সরিয়ে রাখেনি।

নজরুলকে স্কুলে ভর্তি করেছিলেন এক উদারচিত্ত পুলিশ অফিসার। কাজী রফিজউল্লাহ, তাঁর বাড়িতে পাঁচটাকা বেতনে গৃহভৃত্যের কাজে নিযুক্তির পর নজরুলের শিক্ষা সম্ভাবনা দেখে ১৯১৪তে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। (তপাদার, ১৯৯৯ : ১৮৭) বার্ষিক পরীক্ষার পর রানীগঞ্জের শিয়ারসোল এসে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগও তিনি পেয়েছিলেন। মেধাবী ছাত্র নজরুল বৃত্তি পেতেন। তাই ছাত্রজীবন মোটের উপর আনন্দেই কেটেছিল। সেই আনন্দ উপভোগেরও ছাপ আছে তাঁর একাধিক নাটকে। অতঃপর সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি উত্তীর্ণ হলেন তাঁর কৈশোর জীবন। শিক্ষানবিশ সেনাবাহিনীর একজন হয়ে জগতের বিস্তৃতিকে চিনলেন; অনুভব করলেন যে, জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক বড়ো মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধন। তাঁর শিশু-নাটকে এই উপলব্ধিরও রূপায়ণ আছে।

কাজী নজরুল ইসলাম আন্তর্জাতিকমানের সাহিত্যিক হবার পরেও একাধিক সমালোচক বলেছেন তাঁর রচনায় বিস্তার আছে, কিন্তু নেই গবীরতা। গভীরতা ও বিশালতা, দুটিই সমীহযোগ্য। কিন্তু দুটির সম্মিলন ঘটে খুব কম শিল্পীরই ভাগ্যে। যদিও শুধু একটি গুণকে ধারণ করেও অনেকে পৃথিবীর বিশাল শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে বেঁচে রয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, সমালোচকদের তির্যক মন্তব্য থাকলেও নজরুল-সাহিত্যের একটি বিরাট অংশ তা ভরিয়ে দিয়েছে। যেখানে নজরুলের সার্বিক কর্মের সাফল্যের বিষয়েই সমালোচকেরা সন্দিহান, সেখানে তাঁর 'শিশু সাহিত্য' নিয়ে চর্চার বিষয়টি যে বাহুল্য, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই তাঁর সৃষ্টির এই দিকটি নিয়ে তেমন কোনো মূল্যায়ন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। এমনকি তাঁর অনেক শিশু-সাহিত্য গ্রন্থ আজও অপরিচিত রয়ে গেছে।

নজরুলের শিশু-সাহিত্যের পরিমাণ সম্পর্কেও সাধারণের ধারণা ছিল অন্যরকম। সাত/ আটটি ছড়া বা কবিতা এবং দু-একটি নাটিকা ছাড়া তাঁর যে কোনো শিশু-সাহিত্যের নিদর্শন আছে একথাই আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর সমগ্র শিশু-সাহিত্যকর্ম যখন মুদ্রিত রচনাবলীতে স্থান পেল তখন চমকিত হতে হল এই দেখে যে, তাঁর শিশু-সাহিত্য, পরিমাণের দিক থেকে অন্যান্য রচনার সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দিতে পারে।

প্রকৃতি তন্ময়তা যেমন শিশুর এক দিক, অপরদিক তেমন তার বাস্তবতাবোধ, ঠেকে শেখার অভিজ্ঞতা লাভ। এছাড়া তাঁর শিশু-রচনায় যেমন রয়েছে ফুল-পাখি জীব-জন্তুর সমাবেশ, তেমনই রয়েছে শিশুমনের কল্পনার সমাহার, শিশুসাহিত্য রচনাকালে স্রষ্টাকে যে শিশুর মতোই হতে হয়, সে-সম্বন্ধে নজরুল সদা সচেতন ছিলেন। তাঁর এই শিশুসুলভ চাপল্যের জন্যেই শিশু-সাহিত্য রচনায় অসাধারণ সফলতা এসেছে। তাঁর শিশুসুলভ খামখেয়ালিপনা, ভাবালুতা, বাধাবন্ধনহীনতা ও হাস্যপরিহাসের লঘুতা প্রকৃত শিশুমনেরই অভ্রান্ত অভিব্যক্তি। এই শিশুমনের জন্যই তিনি বড়োদের রচনার অনেক জায়গাতেই ভারসাম্যহীনতা, অসংযম, উচ্ছ্বাস প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন এবং সেইসব স্থানে তাঁর সাহিত্যের রস-নিবেদন ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এই শিশুমনের অবস্থানের জন্যই তিনি স্পষ্ট শিশুভাবে ভাবিত হয়ে সার্থক শিশু-সাহিত্য রচনা করতে পেরেছেন। পরিমাণে স্বল্প হলেও উৎকর্ষের বিচারে তাঁর শিশু-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের এক দুর্লভ সম্পদ। একথা বলাও অত্যুক্তি হবে না যে, শিশু-সাহিত্যের কোনো কোনো জায়গায় তিনি প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শিশুদের প্রাণ ঢেলে ভালোবাসতে না পারলে প্রকৃত শিশু-সাহিত্য রচনা করা অসম্ভব। নজরুলের সঙ্গে শিশুদের যোগ ছিল আত্মিক, তাই হয়তো তিনি শিশুমনকে অন্তর থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যা ফল্গুধারার মতো উপচে পড়েছে তাঁর শিশু-সাহিত্যে।

নজরুলের এই শিশুসুলভ স্বভাবের সঙ্গে শিশুদের হৃদয়ের সংযোগের যে সূত্র তা নিহিত কিন্তু তাঁর শৈশব অবস্থা থেকেই। তবুও তিনি তাঁর প্রতিবাদী মানসিকতা, মানবমিলনের বাণী এবং সংগীতের মাধুর্যের দিক থেকেই তাঁর সাহিত্যের বিচার্য হয়েছেন। কিন্তু শিশু-কিশোরদের জন্য তিনি কী লিখেছেন তার সন্ধান করেছেন খুব কম গবেষক। নজরুলের সৃষ্টিভুবনের সেই অংশটিতেই প্রবেশ করতে চাই। কিন্তু তার আগে শিশু-নাটক সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে নেবার প্রয়োজন আছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম নিও-ক্লাসিক্যাল যুগের দর্শনবিদরা ছোটোদের কথা একটু ভাবতে শুরু করেন। এই যুগেই প্রথম ছোটোদের জন্যে স্বতন্ত্র শিক্ষা ও আনন্দের ব্যবস্থা করা উচিত – এই ভাবনা দেখা দিল। ইংরেজ দর্শনবিদ জন লক (John Locke, 1632-1704) ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করলেন তাঁর বই 'An Essay Concerning Human Understanding'। এই গ্রন্থেই আছে তাঁর তত্ত্ব 'Tabula Pasa' অর্থাৎ শূন্য পাতা (Blank Slate)। তিনি বললেন জন্মের পরেই মানুষ অর্থাৎ শিশুদের মন থাকে সাদা পাতার মতো। অভিভাবকদের কর্তব্য হল সেই পাতায় যথার্থ ধারণাগুলোকে উৎকীর্ণ করে দেওয়া যাতে তাদের ভবিষ্যৎ ভালো হয়। তিনি লিখেছিলেন সেই অমোঘ বাক্য– ছোটদের শেখাতে হবে জোর না করে, আনন্দের মধ্য দিয়ে :

> Children may be Cozen'd into a knowledge of the letters; be taught to read, without pereceving it to be anything but a sport, and play themselves into that which others are whipp'd for. (Locke, 1909 : 149)

আরও আশ্চর্য তিনি ছোটোদের জন্য ছবিসহ বই তৈরি করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ছোটোদের বইয়ের সঙ্গে ছবির ধারণার সেই প্রথম সূত্রপাত। (সুমিতা, ২০১৪ : ১৭৩)

শিশু-সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্যই হলো শিশুদের আনন্দদান। আনন্দ না পেলে শিশু কোনো কিছুই করতে চায় না। তাই শিশু-সাহিত্য তো বটেই, শিশু-শিক্ষাতেও আনন্দের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকান মনস্তত্ত্ববিদ থর্নডাইকের (Edward Lee Thorndike, 1974-1949) শিখনের ফললাভের সূত্র থেকে দেখা যায় যে আনন্দ বা তৃপ্তিলাভ শিখনকে সম্ভবপর ও স্থায়ী করে। (Thorndike, 1923 : 96) শাস্তি বা পুরস্কারের উপর যতগুলি গবেষণা হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে আনন্দ বা তৃপ্তি হচ্ছে শিক্ষার পরম সহায়ক। যে শিখনে শিশু তৃপ্তি বা আনন্দ পায় তা সে স্বাভাবিক ও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করে, আর যেখানে সে আনন্দ পায় না তা সে পরিহার করে।

এই ধারণা থেকেই শিশুর শিক্ষাকে শিশুর আগ্রহভিত্তিক করে তোলার প্রয়াস শুরু হয়েছে। শিশু-সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য শিশুদের আনন্দ দান। লীলা মজুমদারের মতে : 'ছোটোরা পড়ে মজা পাবার জন্য', মজা না পেলে হাজার ভালো বই হলেও পড়ে না।' (লীলা, ১৯৮১) আর রবীন্দ্রনাথের মতে :

> সূর্যের আলো নাহিলে গাছ ভালো করিয়া বাড়ে না, আমোদ প্রমোদ না থাকিলে মানুষের মনও ভালো করিয়া বাড়িতে পারে না। (উপেন্দ্রনাথ, ১৩৭৯ : ৩৯৯)

নীতি-উপদেশের পরিবর্তে শুধু আনন্দ রয়েছে বলে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট শিশু-সাহিত্যের দার্শনিক তাত্ত্বিকতা তাঁর রচনাগুলিকে শিশু-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করার ক্ষেত্রে কিছুটা বাধা – এ অভিযোগ অনেকেরই। তাছাড়াও আছে অস্পষ্টতা; রবীন্দ্রনাথ নিজেও সেকথা জানতেন। *খাপছাড়ার* প্রারম্ভে তাই কবির স্বীকারোক্তি :

> সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে
> সহজ কথা যায় না লেখা সহজে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৩ : ৪)

পুনশ্চ কাব্যের 'ছেলেটা' কবিতার অম্বিকে মাস্টার যখন দুঃখ করে বলেন :

> শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো পড়তে ওর মন লাগে না কিছুতেই, এমন নিরেট বুদ্ধি। তখন কবির উপলব্ধি – এ শিশুর ক্রুটি নয়। 'সে ক্রুটি আমারই'। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৩ : ২৬০)

তবে রবীন্দ্র-সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালে শিশু-কিশোর সাহিত্যে নিবেদিতপ্রাণ এমন কিছু রচনাকার এলেন যাঁরা বাংলা শিশু-সাহিত্যকে নতুন মাত্রা দান করলেন।

বাংলা শিশু-সাহিত্যের ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে মূলত ছড়া, গল্প, উপন্যাস, কবিতা নিয়ে। প্রধান শক্তিশালী মাধ্যম নাটক সেখানে অনুপস্থিত। খুব কম শিশু-সাহিত্যিক নাটক রচনা করেছেন। সেই নাটকগুলির মধ্যে আরও কম সংখ্যক নাটক শিশু-নাটক হিসেবে সার্থকতা ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

বাংলা সাহিত্যে শিশুবিভাগের রচনাগুলি ভালোভাবে বিচার করলে ভাবের দিক দিয়ে দুটি মুখ্য শ্রেণি দেখতে পাওয়া যায়। এক. শিশুদের সাহস, উদারতা, ত্যাগ ইত্যাদি মহৎ গুণ সম্পর্কে প্রেরণা ও শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে লিখিত রচনা। দুই. শিশুদের আনন্দদানের অভিপ্রায়ে প্রণীত কল্পনাপ্রধান রচনা। প্রথম শ্রেণির রচনা উনিশ শতকে বেশি করে সৃষ্টি করার রেওয়াজ ছিল। রবীন্দ্রযুগে দ্বিতীয় শ্রেণির রচনার উপর জোর পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণির রচনা সৃষ্টিই দুরূহতর কাজ। এখানে শিশু মনের জন্য আনন্দ সৃষ্টিই মুখ্য, কোনো সৎ গুণ সম্পর্কে তাকে শিক্ষা দেওয়া গৌণ। দ্বিতীয় শ্রেণির রচনাকার হতে হলে যথার্থ শিশু মনের খবর জানতে হয়। আর শিশু মনের সংবাদ জানা বয়স্কের পক্ষে অতিশয় জটিল কাজ সন্দেহ নেই। শিশু মনের সঙ্গে পরিপূর্ণ একাত্ম যোগ না থাকলে, শিশুভাবে জারিত না হলে প্রকৃত শিশু-সাহিত্য রচনা অসম্ভব। শিশুর মন খেয়ালি ও কল্পনাপ্রবণ। তাই শিশু-সাহিত্য অবাধ কল্পনার রঙে-রেখায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শিশু-সাহিত্যে যে শিশু দেখা যায় তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাস্তবিক শিশু নয়, সাহিত্যিকের মন-গড়া শিশু। তাই প্রকৃত শিশু-সাহিত্য রচনার প্রশ্নটি এখনো বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে সমাদর লাভ করেনি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের শিশুও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তব শিশুর কাছাকাছি গেলেও তার সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাতে অপারগ হয়েছে।

আমাদের প্রবন্ধের লক্ষ্য হল শিশু-নাটক, বিশেষ করে নজরুলের শিশু-নাটক বিষয়ে আলোচনার সূত্র ধরেই এসেছে পূর্বোক্ত শিশু-সাহিত্যের প্রসঙ্গ। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইউরোপে ছোটদের জন্য যে ভাবনা শুরু হয়েছিল, তার স্বর্ণযুগ দেখা দিল উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। আর ইউরোপীয় সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও উনিশ শতক থেকেই কিছু পৃথক মনোযোগ দেখা দিতে শুরু করে শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে। তার উজ্জ্বল প্রকাশ তৎকালীন শিশু-কিশোর পত্রিকাগুলি। এ প্রসঙ্গে 'সখা', 'সাথী', 'মুকুল' ও 'বালক'—এর নাম উল্লেখ্য।

উনিশ শতকের শিশু-কিশোরদের জন্যে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির ধারা যখন বিশ শতকেও প্রবাহিত হয়েছে তখন সকলেই ছোটোদের উদ্দেশ্যে রচিত বিভিন্ন শ্রেণির লেখা সম্পর্কে সচেতন থেকেছেন। কিন্তু বলাই বাহুল্য, নাটক সেখানে ছিল না

বললেই চলে। তার কারণ সহজেই বোঝা যায়, নাটক রূপবন্ধের পূর্ণতা প্রয়োগ সাপেক্ষে। ছোটোদের জন্য লেখা যত সহজ তাদের জন্য নাটকের আয়োজন করা ততই দুরূহ। সেইজন্যেই বাংলা শিশু-নাটকের প্রকৃত উদ্ভব ঘটেছিল খানিক পরে। এ কাজও প্রথম করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, আরও অনেক কিছুর মতোই। বাংলায় প্রথম শিশু-নাটক প্রকাশিত হয় 'বালক' পত্রিকার হাত ধরে আশ্রম বালকদের মনোরঞ্জন ও মনোরঞ্জনের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে। নাটকটি 'মুকুট'।

নাটক বলতে কী বোঝায় সে-সম্পর্কে আলোচনা এখানে বাহুল্য। তবে প্রসঙ্গিক, শিশু-নাটক বলতে ঠিক কী বুঝি আমরা। শিশু-নাটক বলতে বোঝায় সেই ধরনের নাটক, যেখানে নাট্য আখ্যান হবে শিশুদের জন্য আনন্দদায়ক, শিশুদের অনুভূতিগম্য এবং শিশুরাই সেখানে প্রধান চরিত্র। সেই সঙ্গে কল্পনার বিকাশের অবকাশ থাকবে যেমন শিশুপাঠ্যে, তেমনই সাধারণ সৎশিক্ষাও তারা পাবে।

এককথায়, শিশু-নাটক হল শিশুদের মনোবিকাশের সহায়ক নাটক, শিশু-নাটক সম্পূর্ণ আলাদা একটি শিল্প, যা নিজ ধর্মের কারণেই অন্যান্য নাটকের থেকে স্বতন্ত্র। David Wood তাঁর *Theatre for Children* গ্রন্থে এ সম্পর্কে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা অনেকটা এরকম :

> Theatre for Children is a separate art-form with qualities that make it quite distinct from adult theatre; it has its own dynamics and its own rewards. Quality theatre for children is valuable, in that it opens the door for children to a new world of excitement and imagination. (David, 1999 : 33)

উক্ত গ্রন্থে তিনি শিশুদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যও নির্দেশ করেছেন। যেমন শিশুনাট্যে মজাই মুখ্য বিষয়। সঙ্গে থাকবে অনাবিল আনন্দের স্রোত। শিশুরা কল্পনার জগতে বিচরণ করতে ভালোবাসে। শিশু মাত্রই কল্পনা-প্রবণ। নাটকের বিষয় ও চরিত্ররা যেন তার কাল্পনিক বিশ্বে ডানা মেলতে সাহায্য করে। শিশুর সহজাত চাহিদা ঘটনার হঠাৎ পরিবর্তন। নাটক পাঠে বা দর্শনে সে এমনটাই আশা করে। শিশু-নাটকে পরিমিত ভয় বা উত্তেজনার পরিবেশ থাকতেই পারে। তাতে শিশুরা নাটকটি পড়ে বা দেখে রোমাঞ্চিত হতে পারে। মিথ বা পৌরাণিক কাহিনিকে নতুনভাবে উপস্থাপিত করে শিশু-নাটক লেখা হলে শিশুদের কাছে তা সহজেই গ্রহণীয় হতে পারে। শিশু চায় – পুতুল, কাক, কুকুর, বিড়াল, পাখি, পেঁচা, হাঁস, বাঁদর, বাঘ, সিংহ, শিয়াল, হরিণ ইত্যাদি জীব-জন্তুগুলি তৎসঙ্গে কথা বলুক। রাম, রাবণ, জাম্বুবান, হনুমানরা তাদের মতো আচার-আচরণ করুক। এক্ষেত্রে রূপকথার ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প বলার ধরনটি কিংবা ছোটোবেলায় পুতুলখেলা, পুতুলের বিয়ে দেওয়ার বিষয়গুলি স্মরণ করা যেতে

পারে। শিশু-নাটকে ন্যায়বিচার অর্থাৎ সত্যের জয়, অসত্যের পরাজয়ের একটা বার্তা থাকা জরুরি। শিশুর মন সবসময় লালকমল, নীলকমলের কিংবা রাজকন্যাকে উদ্ধার করা রাজপুত্র অথবা ডাকাতকে রুখে দেওয়া খোকার পক্ষে সায় দেয়। শিশু-নাটকে শিশু মনের উপযোগী বিতর্ক থাকতেই পারে। অর্থাৎ ছোটোদের জন্যে লেখা নাটকের আলাদা একটা রূপরেখা আছে। এই রূপরেখা শিশু-নাটকের একান্ত নিজস্ব। আর একটি কথা, ছোটোদের নাটকের মূল লক্ষ্য বিনোদন বা আনন্দদান হলেও শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যে শিশু-নাট্যের ক্ষমতা অপরিসীম। শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিশু-নাটকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অতুলনীয়। বস্তুত শিশু শিক্ষার সঙ্গে শিশু-নাটকের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

শিশু-নাটকের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই 'শিশু-নাটক' বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি তার একটি ধারণা তৈরি করে নেওয়া দরকার। 'শিশু-নাটক' শব্দবন্ধটিকে বিশ্লেষণ করলে দুটি শব্দ সামনে আসে – 'শিশু' ও 'নাটক'। অর্থাৎ শিশুদের উপযোগী যে নাটক, তাকেই 'শিশু-নাটক' বলা যেতে পারে। এবারে প্রশ্ন আসে 'শিশু' কাদের বলবো আমরা। মনোবিজ্ঞানীদের মত অনুযায়ী তিন থেকে এগারো বছর বয়স পর্যন্ত যেকোনো মানব সন্তানকেই আমরা 'শিশু' বলে চিহ্নিত করতে পারি। (সুজিৎ, ২০০৭ : ৪৮) কেউ কেউ আবার এই পর্বটিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন – তিন থেকে সাত এবং সাত থেকে এগারো, কেউ কেউ আবার চৌদ্দ বছর পর্যন্তও সময়সীমা ধরেন। যদিও সময়সীমাকে সংকীর্ণ অর্থে 'শিশু' এবং বৃহৎ অর্থে 'শিশু' ও 'কিশোর' দুই বলতে পারি। মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud : 1856-1937) শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্বটিকেই 'শিশু' বলে চিহ্নিত করেছেন। এই বয়ঃক্রম অনুযায়ী লিখিত নাটকই হল 'শিশু-নাটক'। শিশু-নাটক শিশুর পাঠের বা অভিনয়ের উপযোগী নাটক। যার মধ্য দিয়ে শিশু-মনের বিকাশ ঘটে। তারা কুসংস্কারমুক্ত হতে শেখে, এবং সমাজচর্চাকে নিজের চোখ মেলে দেখতে শেখে, শিশুরা বুঝতে পারে তাদের 'ভালো' বা 'মন্দ'। আর এই ভালো বা মন্দটি বোঝানোর দায়িত্ব থাকে কিন্তু নাটককারের। প্রসঙ্গক্রমে লীলা মজুমদারের একটি বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে :

> তিনি মনে করেন যা কিছু ভালো বা মন্দ সবটুকুরই মোকাবিলা করতে হবে সততার সঙ্গে এবং তা পরিবেশন করতে হবে সরস ভঙ্গিতে। ছোটোদের নাটক মানে 'সঙের নাচ' নয়, তাদের বিশ্বজগৎ সম্পর্কে সচেতন, সহানুভূতিশীল আর সশ্রদ্ধ করে তোলার আনন্দপাঠ। (লীলা, ১৯৮১)

পূর্বেই বলেছি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ছোটদের বাংলা নাটকের গোড়াপত্তন রবীন্দ্রনাথের হাতে 'মুকুট'-এর মাধ্যমে। তাঁরই সূত্রে এরপর

একে একে এসেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঠাকুরবাড়ির মেজোপুত্রবধূ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, মুগুযার রায়চৌধুরী পরিবারের উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, সুনির্মল বসু, বীরেন্দ্রলাল ধর, কুমারেশ ঘোষ এবং অবশ্যই কাজী নজরুল ইসলাম। এঁদের পরবর্তী তালিকাটিও কিন্তু কম দীর্ঘ নয়।

এই মুহূর্তে প্রাসঙ্গিক কাজী নজরুল ইসলাম রচিত শিশু-নাটক এবং সেই নাটকগুলি প্রসঙ্গে পর্যালোচনা। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয়কে প্রথমেই আমদের মাথায় রাখতে হবে যে, শিশু-নাটক সম্পর্কে বৈশিষ্ট্য ঠিক করেছেন তত্ত্ববিদরা, কিন্তু রচনাকার সর্বদা তত্ত্ব মেনে চলেন না। ফলে শিশু-নাটকের ক্ষেত্রে সর্বোপরি নজরুলের শিশু-নাটকের ক্ষেত্রেও যেমনভাবে তত্ত্বের দিকটা দেখব, তেমনভাবেই রচনাকারের নিজস্ব আবেগ, অনুভূতি ও সৃজনশীলতাও লক্ষ করবো।

১৯২৩ সালে বহরমপুর জেলে থাকা অবস্থায় রাজনৈতিক বন্দিদের অনুরোধে একটা নাটক রচনা করেন নজরুল। নাটকটি অভিনীত হলেও পরে পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্বে নজরুল বড়দের জন্যে তো বটেই এমনকি শিশুদের জন্যেও কয়েকটি নাটিকা ও একাঙ্কিকা রচনা করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে নজরুলের লেখা প্রথম নাট্য সংকলন *ঝিলিমিলি* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে *ঝিলিমিলি নওরোজ* পত্রিকায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। চারটি নাটক *ঝিলিমিলি*, *সেতুবন্ধ*, *শিল্পী* ও *ভূতের ভয়* সম্বলিত *ঝিলিমিলি* নাট্যগ্রন্থটি প্রকাশের পরে একে একে প্রকাশ পেতে থাকে একাধিক রেকর্ড নাটক, বেতার নাটক, গীতিনাট্য এবং গীতিনাটকের আশ্রয়ে শিশু-নাটক। এরই মধ্যে একাধিক একাঙ্ক নাটকও রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য *আলেয়া*, *মধুমালা* ব্যতীত তাঁর রচিত নাটক প্রধানত একাঙ্কিকা। তাঁর নাটকের আঙ্গিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, তাঁর নাটক সঙ্গীতনির্ভর। গানের চাবি দিয়েই তিনি এই নাট্য-ঘটনার নানা পর্ব উন্মোচিত করতে চেয়েছেন। যদিও সেখানে একাধিক কবিতাও স্থান পেয়েছে।

নজরুলের শিশু-নাটক বলে বিজ্ঞাপিত আছে একাধিক নাটক। কিন্তু আমি গ্রহণ করেছি প্রতিনিধিস্থানীয় তিনটি শিশু-নাটক। কারণ এই তিনটিকেই আমি যথার্থ বলে মনে করেছি। অন্যগুলির ক্ষেত্রে বড়োদের উপাদানই অধিক বলে মনে হয়েছে আমার। প্রতিনিধিস্থানীয় তিনটি নাটক হল :

ক. পুতুলের বিয়ে

খ. জাগো সুন্দর চিরকিশোর

গ. পণ্ডিত মশায়ের ব্যাঘ্রশিকার

পুতুলের বিয়ে-র প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৪০ বঙ্গাব্দে (এপ্রিল ১৯৩৩)। প্রথম প্রকাশকালে গ্রন্থযুক্ত নাটিকা ও কবিতার তালিকায় রয়েছে যথাক্রমে 'পুতুলের বিয়ে', 'কালোজামরে ভাই', 'জুজুবুড়ির ভয়', 'কে কী হরি বল', 'ছিনিমিনি খেলা', 'কানামাছি', 'নবার নামতা পাঠ', 'সাত ভাই চম্পা', 'শিশু জাদুকর'। 'কালোজামরে ভাই' ও 'শিশু জাদুকর' ব্যতীত অন্য রচনাগুলিও কম বেশি নাট্য-আঙ্গিকেই রচিত। রবীন্দ্রনাথের *পুনশ্চ* কাব্যান্তর্গত 'খেলনার মুক্তি' (রচনা ১৩ আষাঢ়, ১৩৩৯) কবিতাটি সম্ভবত নজরুলের *পুতুলের বিয়ে* রচনার প্রেরণা।

পুতুলের বিয়ে নাট্যগ্রন্থটির শুরুতেই বন্ধনীতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে 'ছোটো মেয়েদের নাটক'। এই নির্দেশই আমাদের বলে দেয় নাটকটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে। ছোটোদের জন্য লেখা ছোটো নাটক *পুতুলের বিয়ে* রচনাটিকে নাটিকা বলাই ভালো। বিয়ে বিয়ে খেলা, তাও আবার পুতুলের। এই নাট্য-বিষয়কে অবলম্বন করে লেখা নাটিকাটিতে নজরুল তাঁর ভাবনার আগল খুলে দিয়েছেন। জাতি-বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা, বাল্যবিবাহ ও সতীন সমস্যার মতো বহু গভীর সমাজ-ভাবনা নাটককারের লেখনির মধ্য দিয়ে চিত্রিত হয়েছে। ছোটোদের জন্য লেখা নাটিকাটি বড়োদেরও ভাবনার খোরাক জুগিয়েছে। 'ছোটো মেয়েদের নাটক'রূপে নজরুল ন্যাটিকাটিকে চিহ্নিত করেছেন। নাটিকাটিতে পুতুলের বিয়ে উপলক্ষে নাট্যচরিত্রগুলি একত্র হয়েছে, আসন্ন বিয়ের আলোচনায় তারা মগ্ন হয়ে উঠেছে। টুলি নামের মেয়েটির মেয়ে-পুতুলের সঙ্গে বামলির ছেলে-পুতুল ডালিম কুমারের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়। টুলি একসময় প্রস্তাব করে "ঐ দেখ বেগম আস্‌ছে। –হ্যাঁ, দেখ কম্‌লি, বেগমের সুন্দর একটা জাপানী পুতুল আছে, ঐটের সঙ্গে তোর চীনে পুতুলের বিয়ে দেব।" আপাত নিরীহ এই বাক্যের মধ্যে নজরুলের বিশ্ব সম্প্রীতিবোধের পরিচয় মুদ্রিত হয়েছে। 'কম্‌লি' ও 'বেগম', 'জাপানী' ও 'চীনে' এবং 'বিয়ে' — শব্দগুলির সম্পর্কের মধ্যে যে জাতি বৈষম্য অগ্রাহ্য করে, ভৌগোলিক সীমা ছিন্ন করে মিলিত হওয়ার মানবিক আবেদন ধ্বনিত হয়েছে, বাংলা নাট্য-সাহিত্যে তা বিরল দৃষ্টান্ত রূপেই বিচার্য। (সমিত কুমার, ২০১৫ : ভূমিকা) নাটিকাটিতে মুসলমান সমাজের রক্ষণশীলতা ও বাল্যবিবাহের প্রতি নাটককারের তির্যক দৃষ্টিও পরিলক্ষিত হয় বেগম ও কমলির সংলাপে :

> বেগম ॥ বাপ্ রে! আব্বা যা বকেন ভাই, আমি বাইরে বেরুলে। আম্মাকে বলেন আমাকে পর্দার ভিতর বিবি করে রাখতে।
>
> কম্‌লি ॥ মা গো মা! কি হবে! অনাচার সইতে নারী! আট বছরের মেয়ে আবার বিবি হবে! যা না তাই!

এই ধরনের অসংখ্য গভীর নাট্যভাবনা মণিরত্নের মতো নাটিকাটিতে ছড়িয়ে রয়েছে। টুলি বলছে– "কি? আমার মেয়ে সতীন নিয়ে ঘর করবে? আমি বেঁচে থাকতে নয়।

আয় পুঁটু, তোর অন্য বর খুঁজি গে।" সতীন সমস্যার উত্থাপন শুধু নয়, এক নারীর প্রতিবাদ এবং 'অন্য বর খোঁজা'র মধ্যে সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের দুঃসাহসী পদক্ষেপ প্রতিধ্বনিত হয়েছে নাট্যকাহিনিতে। সতীন সমস্যার যন্ত্রণায় ছোটো মেয়েটির 'মাতৃহৃদয়' বিদীর্ণ হয়েছে। ছোটো মেয়ে টুলি হয়ে উঠেছে সমাজের বঞ্চিত নারীর প্রতিনিধি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। পুতুলের সতীন হওয়ার মতো খেলাকেও সে তুচ্ছ করে না– "হতিস্ মেয়ের মা, তা হলে বুঝতিস্।"

খেঁদি কম্‌লিকে সমাজের গভীরতর এক স্পর্শকাতর সমস্যার কথা বলে– "না ভাই, ও-কথা বলিস্‌নে। বাবা বলেছেন, হিন্দু মুসলমান সব সমান। অন্য ধর্মের কাউকে ঘৃণা করলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন। ওদের আল্লাও যা, আমাদের ভগবানও তা।" পুতুলের বিয়ে খেলাকে কেন্দ্র করে নজরুল এই নাটিকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে বীজ রোপণ করলেন, সেই বৃক্ষে ইংরেজ-বিদ্বেষও ফল হয়ে ফলল। কম্‌লির দাদা মণি তার 'মায়ের পুতুলের ঠ্যাং ছিঁড়ে দেয়।'

নাটকটিতে ব্রাহ্মণের মন্ত্রপাঠ তথা পুরোহিত তন্ত্রকে বিদ্রূপ করেছেন নাটককার। মণি বলেছে :

> অনুস্বারং আর বিসগং যদি সংস্কৃতং হয়তং তবে আমিং কেনং বসতং। ...ওয়ানং মর্নং আই মেটং এ লেমং ম্যানং। ক্লোজং টু মাই ফার্মং।

দুর্বোধ্য সংস্কৃত মন্ত্রের শৃঙ্খল নয়, বরং হৃদয়ের বন্ধনের উপর জোর দিয়েছেন নজরুল। পারস্পরিক সৌজন্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে বিয়ের সময়। কম্‌লি বর-কনেকে বরণ করার সময় বেগমকে 'ওদের বিয়ের' গান গাইতে অনুরোধ করেছে। 'শাদী মোবারকবাদী শাদী মোবারক' – বেগমের এই সঙ্গীত গীত হওয়ার পর কম্‌লি আশীর্বাদের গান গেয়েছে – 'সাবিত্রী সমান হও, লহ লহ এই আশীর্বাদ।'

নাট্য চরিত্রের স্বভাব অর্থাৎ চরিত্রের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী যথার্থ সংলাপ রচনা করেছেন নজরুল। পঞ্চি ময়মনসিংহের ও খেঁদি বাঁকুড়া জেলার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেছে। এ নাটিকার বড়ো সম্পদ ছড়া ও গান। "আয়না আয়না আয়না / সতীন যেন হয় না।/ উদ্‌বেড়ালি দুধ খায় / স্বামী রেখে সতীন খায়।" ছড়ায় নাট্যভাবনার কাঙ্ক্ষিত সুর যেমন ধ্বনিত হয়েছে, তেমনি অসামান্য দক্ষতায় নাট্যসঙ্গীত রচনা করেছেন নজরুল :

> মোরা একই বৃন্তে দুটি ফুল হিন্দু-মুসলমান।
> মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ॥

বাংলা কাব্যের অক্ষয় চিহ্ন, এই গানটি আলোচ্য নাটিকাটির অনেক গানের মধ্যে একটি। আসলে *পুতুলের বিয়ে* নামক ছোটো মেয়েদের অভিনয় উপযোগী এই

নাটিকাটিতে নজরুল শিশুদের জন্য আনন্দ পরিবেশনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এটি মূলত কৌতুক রসের একটি নাটিকা। এই নাটিকায় কম্‌লির সুশ্রী-পুতুল ডালিম কুমার ও কুৎসিত চীনের পুতুল কুচুং-এর সঙ্গে যথাক্রমে টুলির মেম পুতুল পুটুরানী ও বেগমের জাপানী পুতুল গেঁইসার বিয়েকে কেন্দ্র করে নজরুল আসলে হাস্যরসই পরিবেশন করতে চেষ্টা করেছেন। সমগ্রভাবে দেখতে গেলে যদিও এই হাস্যরস সবসময় উচ্চস্তরের হয়নি, তবুও কৌতুক উপাদান নেহাতই কম নয়। পাঁচ মেয়ে কম্‌লি টুলি, পঞ্চি, খেঁদি ও বেগম-এর মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাকেও ব্যবহার করা হয়েছে। এই ভাষা পরিবেশনেও কতকটা হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস আছে। একমাত্র কমলির দাদা মণির কথাবার্তা ও আচরণে খানিকটা কৌতুক উপভোগ করা যায়। মণি পুরুত ঠাকুরের টিকি দেখে বলেছে –

> পুরুতঠাকুরের টিকিটি কি সুন্দর! যেন পারে যাবার টিকিটি! আগায় আবার জবা ফুল বাঁধা, যেন কুঁকড়ো ঝুলছে।

পুরুত ঠাকুরকে উপলক্ষ করে আবার মণির উক্তি :

> ঠাকুরমশাই, ঠাকুরমশাই! আপনার চট্টোপাধ্যায় মশাই যে বঙ্কিম হয়ে চাতকপত্নীর মত হ্যাঁ করে আছেন! বাবা, বটিত নয় যেন জাঁতিকল! ওটা কি? গামছা? ওটা গরম ছা ত নয়, গাম ধাড়ি!

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই নাটকের অভিনবত্ব সামান্যই। চরিত্রগুলিরও তেমন বিকাশ লক্ষ করা যায় না, কিন্তু বিষয়বস্তুকে অনুধাবন করতে পারলেই বেরিয়ে আসবে এই নাটকের প্রকৃত তাৎপর্য। একদিকে সমাজের নানা সমস্যা, জাতি-বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধাচরণ অন্যদিকে মানবিক-উত্তরণ, প্রগতিশীল মানসিকতা প্রভৃতি যুগোপযোগী বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে এ নাটকে।

পুতুলের বিয়েকে কেন্দ্র করে ছোটো মেয়েদের ঘরোয়া কথোপকথন রচনায়ও নজরুল নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। কয়েকটি ছড়া প্রণয়নে নজরুলের স্বাভাবিক কৃতিত্ব লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে পুতুল খেলতে খেলতে মেয়েদের প্রথম গানটি উদ্বৃত করা যেতে পারে :

খেলি আয় পুতুলের খেলা
বয়ে যায় খেলার বেলা সই।
বাবা ঐ যান আপিসে ভাবনা কিসের,
খোকা দোলায় ঘুমায় ঐ ॥
দাদা যায় ইস্কুলেতে, মা খুড়িমা
রান্না করেন হেঁসেলে,
ঠামদি দাওয়ায় ঝিমোয় বসে
ফোকলা বদন মেলে।

আয় লো ভুলি পঞ্চি টুলী
পটলা খেঁদি কই ॥

হিন্দু ও মুসলমানের মিলন সম্পর্কে এই নাটিকাটিতে নজরুলের যে মনোভাব লক্ষ করা যায় তা নিতান্তই প্রশংসার্হ। শিশু-নাটকের অবয়বে মনোরঞ্জনের মধ্য দিয়েও এই যে শিক্ষামূলক বার্তা দেবার প্রয়াস তার কথাই তো আমরা শুনেছিলাম সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে। খেঁদি যখন কমলিকে বললে যে, তার পুতুলের সঙ্গে মুসলমান বেগমের বিয়ে কেমন করে হবে তখন কমলির মুখ দিয়ে নজরুল বলিয়েছেন :

> না ভাই ও কথা বলিস নে। বাবা বলেছেন, হিন্দু মুসলমান সব সমান। অন্য ধর্মের কাউকে ঘৃণা করলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন। ওদের আল্লাও যা আমাদের ভগবানও তা।

এই চিরসত্যই হোক আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র।

জাগো সুন্দর চিরকিশোর নাটকটি কিশোরদের জন্য রচিত। গীতপ্রধান রূপক নাটকটি কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৪০-এর ২৪ মে সম্প্রচারিত হয়। আসাদুল হক এর পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করেছিলেন বলে দাবি করেছেন।

জাগো সুন্দর চিরকিশোর নাটকের মধ্যে কল্পনার সঙ্গে কঙ্কন, চাকাম ফুসফুস (আসল নাম ন্যাড়া) ও বেণুর কথোপকথন এবং তার পুষ্পক রথে চড়ে তাদের সাগরগর্ভ ও আকাশে অভিযান যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি মজার। নজরুল এখানে সর্ববাধামুক্ত কল্পনার সঙ্গে শিশুমনকে ছুটিয়ে দিয়েছেন। রূপক-সংকেতের ভিতর দিয়ে নাটিকাটি পরিবেশন করাতে শিশু-কল্পনার বিকাশ হয়েছে বেশি। যদিও সেই কল্পনার পাশাপাশি বাস্তব জীবনের কর্মের প্রসঙ্গও কিন্তু রেখেছেন নজরুল। এতেই প্রমাণ, তিনি কেবল কল্পনায় গা ভাসিয়ে নয়, জীবনের বাস্তবতায় কর্মের যে ভূমিকা তাও কখনও বিস্মৃত হননি।

আসলে এই বেতার নাটকটিতে ভবিষ্যতের স্বপ্ন নির্মাণ করেছেন নজরুল। কিশোরদের স্বপ্নকে মুক্ত আকাশে উড়তে দিয়েছেন তিনি। বিশ্বজুড়ে অবক্ষয় ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে মূল্যবোধ ও নৈতিকতার উদ্বোধন ঘটাতে প্রয়াসীও হয়েছেন তিনি। কবিতা, সংলাপ ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে কিশোর-কিশোরীর স্বপ্ন বড়োদেরও পথ দেখিয়েছে। কঙ্কন ও কল্পনার কথোপকথনে সেই স্বপ্নময় পথের সন্ধান এবং প্রতিকূলতা পেরিয়ে এগিয়ে চলার শপথ ধ্বনিত হয়েছে :

> কঙ্কন। কল্পনাদি, তোমার রথ থামিও না। চল হিমালয়ের গৌরীশঙ্করের চূড়ায়, উত্তরমেরু, দক্ষিণমেরু। বরফ পেরিয়ে নাম না জানা দেশে। চল চাঁদের বুকে, মঙ্গলগ্রহে।

কল্পনা। তোমায় আমি নিয়ে যাবো কঙ্কন, অসীমের সীমা খুঁজতে, অকূলের কূল দেখাতে। তার আগে তোমার পৃথিবীর কাজ সেরে নিতে হবে। ধর– পৃথিবীতে যদি তোমায় কাজ করতে হয় তুমি কী করবে?

কঙ্কন। আমি গাইব গান– আর সারা পৃথিবীর মানুষ ধরবে তার ধুয়া... ।

এই নাটকটিতে নাটকীয়তা কম, বরং কাব্য বেশি। তাই তিনি বারে বারে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সমগ্র প্রতিকূলতা দূর করে স্বপ্ন দেখিয়েছেন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সমবেত সুরে সেই স্বপ্নের স্বীকৃতি দেবে। এরপর কঙ্কন গান ধরেছে :

চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্ ...॥

ডেভিড উড তাঁর 'থিয়েটার অব চিলড্রেন' গ্রন্থে শিশু-নাটকের প্রাথমিক শর্তে উত্তেজনা এবং কল্পনার কথা দাবি করেছিলেন তারই সুন্দর প্রকাশ দেখি আমরা এই *জাগো সুন্দর চির কিশোর* নাটকে। কঙ্কন, কামাল, ওংকার, চাকাম ফুসফুস, বেণু এই পাঁচটি চরিত্র তাদের কল্পনায় 'কল্পনা দিদি'কে কেন্দ্র করে যেভাবে নিজেদের ইচ্ছে ও বাসনাগুলিকে পরিপূর্ণ করবার চেষ্টা করেছে তা রীতিমতো আকর্ষক। খেলতে খেলতে তারা এসে পড়ে তাদের কল্পনার জগতে। কল্পনা দিদি যখন জানায় তাদের ইচ্ছে মতো জায়গায় নিয়ে যেতে সে সহায়তা করবে তখন কামাল ইচ্ছে প্রকাশ করে – সে সাগর পাড়ি দেবে, হবে সওদাগর। তাতে কঙ্কন প্রতিবাদ করে জানায় "সপ্ত সাগর রাজ্য আমার, হব সিন্ধুপতি;/ আমার রাজ্যে কর জোগাবে রেবা ইরাবতী/ কত সিন্ধু ভাগীরথী।" বেণু কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যে নিজেকে না জড়িয়ে হতে চায় 'সকাল বেলার পাখি', সবার আগে কুসুমবাগে তার ডেকে ওঠাটাই আনন্দের। ওংকার আবার বেজায় সাবধানী, সমুদ্রের জলে ভিজে তার সর্দি হবার চাইতে বা যুদ্ধ করে ঝক্কি নেবার পরিবর্তে সে 'গাঁয়ের রাখাল ছেলে' হওয়াটাকেই অনেক শান্তিপূর্ণ বলে মনে করে। কল্পনাদি যখন তাদের সচেতন করে বলতে চায় শুধু গান গাইলেই চলবে না, কর্মও চাই, তখন কঙ্কন বীরদর্পে ঘোষণা করে :

কর্মই তো আমার প্রাণ। কাজ করি বলেই
তো রাত পোহায়।

এও জানায় সে,

আমি হব দিনের সহচর–
বলব, 'ওরে, রোদ উঠেছে, লাঙল কাঁধে ধর।

আসলে শিশুমনের পেলবতায় কল্পনা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে সুন্দর মানসিকতা গড়ে তোলাটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কঙ্কন কল্পনাকে উদ্দেশ্য করে যা বলেছে তাই নজরুলের শিশু-সাহিত্যের অমৃত ইঙ্গিত :

> ওদের নামিয়ে দিয়ে আমায় নিয়ে চল না কল্পনা-দি চাঁদের দেশে। সেখান থেকে আনব অমৃত পৃথিবীতে, জরা মৃত্যু থাকবে না – থাকবে শুধু সুন্দর চির-কিশোর।

তৃতীয় নাটক *পণ্ডিতমশায়ের ব্যাঘ্রশিকার*। নজরুল রচিত এই শিশুতোষ হাসির নাটিকাটি নজরুলের রচনা বলে গৃহীত হলেও সম্ভবত রেকর্ড প্রকাশের পূর্বে *ছায়াবীথি* শীর্ষক কোনো পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৪১ সংখ্যায় এটি ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রামোফোন রেকর্ডে এটি নজরুলের স্বনামে প্রকাশিত হয়। ঢাকা বাংলা একাডেমি প্রকাশিত নজরুল রচনাবলীতে প্রথম এটি মুদ্রিত হয়। পত্রিকায় প্রকাশকালে নজরুল রচয়িতার নাম দিয়েছিলেন মোহাম্মদ লোক-হাসান। রেকর্ডের প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৩৩।

পণ্ডিতমশায়ের ব্যাঘ্রশিকার – এই নামকরণের মধ্য দিয়েই কৌতুক রসের আভাস পাওয়া যায়। স্থান হিসেবে চিহ্নিত বিখ্যাত শিকারি জমিদার ললিতবাবুর বৈঠকখানা। কাল নিশ্চিতভাবে সন্ধ্যাকাল। পাত্র দুজন – পণ্ডিতমশায় ও জমিদার ললিতবাবু উপস্থিত। স্বল্প দৈর্ঘ্যের এই রচনাকে নাটিকা বলাই শ্রেয়। বাঘ শিকার এবং বাঘ শিকারকেন্দ্রিক যে আয়োজন তাকে ঘিরেই আবর্তিত এই নাটকের বিষয়বস্তু। নাটকটির শুরুর কথোপকথনকে একটু দেখে নেওয়া যাক :

পণ্ডিতমশায়	:	বলি ও ললিত বলি, বোকেন্দ্র গন্ধ আসতিছে কেন?
ললিত	:	বোকেন্দ্র-গন্ধ কী পণ্ডিতমশায়?
পণ্ডিত	:	আরে, তাও আর বুজতি পারতিছ না? বোকেন্দ্র-গন্ধ মানে বোকা পাঁঠার খোশবাই, বুঝল্যানি?
ললিত	:	(হাসিয়া) বুঝেছি পণ্ডিতমশায়! আজ বাঘ শিকারে যাব। তাই ওটা কিনে রেখেছি।
পণ্ডিত	:	তোমার সাথে কি এ বোকেন্দ্র-নন্দনও ব্যাঘ্র শিকারে যাবেন?
ললিত	:	হ্যাঁ, পণ্ডিতমশায়! উনি জঙ্গলের ঘুঁটায় বাঁধা থাকবেন আর ওঁর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ব্যাঘ্রমশায় যেই এসে উপস্থিত হবেন, অমনি মাচান থেকে তাঁকে গুলি করব।

এই কথোপকথনের ভাষা থেকেই পরিষ্কার যে বাংলাদেশের কোনো অঞ্চলের শিকার পর্বই এখানে উদ্ধৃত। আবার পণ্ডিতমশায়ের প্রতি ললিতের রসিকতার মনোভাব অধরা থাকে না। তবে এটিকে নাটিকা না বলে নক্‌শা বলাই শ্রেয়। নক্‌শায় যে

লঘুচালে হাস্যরস পরিবেশিত হয়, সেই লঘুচালেই এই রচনাতেও শিকারের দৃশ্যের মাধ্যমে হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে।

পণ্ডিতমশায় যখন বাঘের ডাক শুনে উত্তেজিত হয়ে অধিক কথা বলা শুরু করেন আর ললিত পণ্ডিতমশায়কে চুপ করানোর জন্য প্রবল চেষ্টা চালাতে থাকে তখনকার সেই কথোপকথন শিশুদের তো বটেই এমনকি বড়োদেরও কৌতুকরসে ভরপুর করে তোলে—

পণ্ডিত : অ ললিত, ওটা কী ডাকি উঠল? ওর ডাক তো সুশ্রাব্য নয়।

ললিত : উনি তো আর কীর্তন গাইতে আসছেন না, পণ্ডিতমশায়, যে ওঁর গলাটা সুশ্রাব্য হবে।

পণ্ডিত : অ ললিত, ওই উৎকট গন্ধটা আসতিছে কোনখ্যান থাকি? পাঁঠার গায়ের খোশবাইটা যে নষ্ট করি দিলে।

ললিত : (অসহিষ্ণুভাবে) চুপ করুন পণ্ডিতমশায়! এবার বাঘ কাছিয়ে এসেছে। ওটা বাঘের গায়ের গন্ধ।

পণ্ডিত : কী যে কও ললিত, ব্যাঘ্রের দেহে কখনও অমন বদগন্ধ হতে পারে? ব্যাঘ্ররে যে একটি ভদ্র জানোয়ার বলেই জানি; মা জগদম্বার কি নাক নাই? সে বেটি বদগন্ধ জানোয়ারের পিঠে চড়ি ঘুরে বেড়ায়? তুমি তোমার টর্চো লাইট দিয়ে দ্যাখো — নিশ্চয়ই কোনো কাবুলিওয়ালার গায়ের গন্ধ। আর ও যদি ব্যাঘ্রই হয়, তবে কাবুলি বাঘ, ও গন্ধ বাংলাদেশের জানোয়ারের গায়ে হয় না।

শিশু-নাটকের প্রথম ও প্রধান শর্ত যে আনন্দদান তা কিন্তু এই নাটিকায়, বলা ভালো, এই নক্‌শায় ভরপুর। কোনো নীতিশিক্ষা বা ভারী ভারী কথা নয়, নজরুল তাঁর রচিত রচনার মাধ্যমে পাঠকহৃদয়ে যে কৌতুকরস সঞ্চারিত করতে পেরেছেন সে বিষয়ে আমরা সকলেই নিশ্চয়ই সহমত।

কাজী নজরুল ইসলামের এই তিনটি শিশু-নাটকের আলোচনা থেকেই কিন্তু একটি সত্য আমাদের সামনে উঠে আসে। সেই সত্য হল নজরুল-প্রতিভার বহুমাত্রিকতা সম্পর্কে নতুন করে সচেতন হওয়ার দিক। তিনি বিদ্রোহের ও প্রতিবাদের কবিতা লিখেছেন; সমাজ-মনস্ক ও রাজনীতি-মনস্ক কবিতা লিখেছেন; তিনি নিসর্গ রূপের, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির এবং প্রেম অনুভবের নিবিড় সৌন্দর্যের কবি। তাঁকে কেবলমাত্র কবিতার আধারে আটকে রাখাটা কখনোই সমীচীন নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এবং মধ্যপ্রচ্যের সাংগীতিক ঐশ্বর্যের সম্মিলনে তিনি সৃষ্টি করেছেন বাংলা গানের সমৃদ্ধ এক ধারা। কবিতা ও গানের পাশাপাশি লিখেছেন গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ। সরস কৌতুক প্রবণতাও তাঁর প্রতিভার একটি দিক। এরই সঙ্গে শিশুদের মন ভোলানো যেসব কবিতা তিনি লিখেছেন তার কিছু অংশ অবিস্মরণীয় হয়ে আছে আজও।

এইসব কিছুর পরেও তিনি শিশু-কিশোরদের জন্য এক নাটককার। অনেক নাটককার আছেন যাঁরা কেবল এই একটি ক্ষেত্রেই সক্রিয়। কিন্তু নজরুল-প্রতিভার বহু বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি ভুবনের একটি অংশ হলেও তার এই শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত নাটকগুলি গভীরভাবে আমাদের মুগ্ধ করে। *পণ্ডিতমশায়ের ব্যাঘ্র শিকার* নাটকের নির্মল হাস্যরস মনকে আনন্দ দেয়। *জাগো সুন্দর চির কিশোর*-এর কল্পলোক আর কর্মক্ষেত্র মিলেছে কত অনায়াসে। *পুতুলের বিয়ের* মতো একটি নাটক বাংলা সাহিত্যে সমুজ্জ্বল ব্যতিক্রম। শিশুদের মনকে প্রাদেশিকতা এবং দেশীয়তামুক্ত আন্তর্জাতিকতায় বিস্তৃত করে দেবার স্বপ্ন সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম দেখেছেন এবং সম্ভবত তখনও পর্যন্ত তিনিই একমাত্র।

তথ্যসূত্র

১. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১৩৭৯। রবীন্দ্র-নাট্য পরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬১, তৃতীয় সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ, পৃ. ৩৯৯

২. তপাদার আহমেদ জাহিদ (সংকলক), ২৯শে আগস্ট ১৯৯৯। 'নজরুল জীবনপঞ্জী', *সৃষ্টিসুখের উল্লাসে* পত্রিকা, দুর্গাপুর পুরনিগম, পৃ. ১৮৭

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চৈত্র ১৩৯৩। 'খাপছাড়া', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ৪

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চৈত্র ১৩৯৩। 'ছেলেটা', *পুনশ্চ*, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ. ২৬০

৫. লীলা মজুমদার। কেন ছোটদের জন্য লিখি; প্রতিবেদন, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, কলকাতা, ২১/০৯/১৯৮১

৬. সমিতকুমার দেবনাথ, ২০১৫। 'বাংলা নাট্যচর্চায় নজরুল ইসলামের আবশ্যিক ভূমিকা', প্রমা, শারদীয়, কলকাতা

৭. সুমিতা চক্রবর্তী, ২০১৪। 'ছবি কবিতা ভাষার অতীত ভাষ্য', নতুন কবি সম্মেলন, শারদীয় ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ১৭৩

৮. সুজিৎ ঘোষ, মে ২০০৭। শিশু মনস্তত্ত্ব : একটি প্রেক্ষা, পরিকথা, শিশু ও শিশুমন, সম্পাদক দেবব্রত চট্টোপধ্যায়, সাউথ গড়িয়া, দঃ ২৪ পরগণা, নবম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. ৪৮

৯. David Wood (with Janet Grant) 1999. Theatre for Children. A guide to writig. Adapting, directing and Acting. Ivan R. Dec. 15 March. Page-33

১০. Edward Thorndike Lee. 1923. Education a First Book. the Macmillan Company. New York. 1923, page-96

১১. Locke. John – Some thoughts concerning Education. Edited by Charles W. Elliot. Sections- 149. Vol. XXXVIII. Part-1. the Harvard Classics. New York: P. F. Collier and Son, 1909-14: Bartleby. Com 2001